হিন্দু সংহতি

# স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 9, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, December 2012

*এই খণ্ডিত বঙ্গে এখন মুসলমানের সংখ্যা শতকরা পঁয়ত্রিশ। এই সংখ্যা একান্নতে পৌঁছলেই গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ, ভজন, কীর্তন, মালা, টিকি, মহোৎসব, ভোগারতি সব শেষ হয়ে যাবে। 'সব ধর্ম সমান', 'খেটে খাওয়া মানুষের কোন জাত নেই', 'হিন্দু মুসলমান ঐক্য চাই'—এসব বলার জন্য তখন কেউ থাকবে না।*

*—শিবপ্রসাদ রায়*

## একজন হিন্দু নিহত, ২৬টি জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ

# নদীয়ার তেহট্টে পুলিশি তাণ্ডব

*নদীয়ায় তেহট্টে পুলিশের গুলিতে জখম সুধাময় ঘোষ কলকাতার এন.আর.এস. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।*

গত ১৪ই নভেম্বর নদীয়া জেলার তেহট্টে প্রশাসন থেকে জগদ্ধাত্রী পূজা করার অনুমতি না দিলে নিরস্ত্র হিন্দু গ্রামবাসী অহিংস গণ অবস্থান ও বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশ এই বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চালালে ১ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয় যার মধ্যে দু'জনের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক।

উপরের বর্ণিত ঘটনার গভীরে যেতে গেলে আমাদের বেশ কয়েক বছর পেছনে যেতে হবে। তেহট্ট বাজারের পার্শ্ববর্তী সরকারী জায়গায় স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালনায় জগদ্ধাত্রী পূজা হয়ে আসছে। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই সরকারী জায়গায় জগদ্ধাত্রী পূজা হচ্ছে। দু'বছর আগে তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল এই পূজার উদ্বোধন করে গিয়েছেন। হঠাৎ এ বছর প্রশাসন পূজার অনুমতি দেয়নি। কারণ পূজাস্থলের সন্নিকটে সরকারী খাসজমি দখল করে মুসলমানরা একটি ঈদ্‌গাহ তৈরি করেছে যেখানে ঈদের নামাজ পড়া হয়। বর্তমান সরকার জুলফিকার হাসান সহ মুসলমান নেতৃত্বের চাপে ঈদ্‌গা ময়দানের সম্প্রসারণের জন্য হিন্দুর ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নিয়ে এ বছর পূজার অনুমতি বাতিল করে দেয়। পূজা কমিটি প্যাণ্ডেল তৈরি শুরু করলে পুলিশ এসে বাঁশ খুলে ফেলে দেয়। সরকার ও প্রশাসনের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে তেহট্ট ব্লকের ২৬টি ক্লাব ও পূজা কমিটি সহ সমস্ত হিন্দুরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। পুলিশের সঙ্গে সামান্য বচসা ছাড়া বিক্ষোভ ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু বিনা প্ররোচনায় পুলিশ লাঠি চালালে বিক্ষোভকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনরকম নির্দেশ জারি না করে হঠাৎ পুলিশ গুলি চালালে অশোক সেন (৪৫) নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং সুধাময় ঘোষ সহ প্রায় ১০ জন গুরুতর আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুধাময় ঘোষকে কলকাতার এন. আর.এস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৪ই নভেম্বর গুলি চালাবার পরও প্রশাসনের নির্দেশে হাউলিয়া সহ আশপাশের গ্রামগুলিতে হিন্দুদের উপর পুলিশের পাশবিক অত্যাচার চলছে। প্রশাসনের নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তেহট্টের ঘটনা আবার তা প্রমাণ করলো। প্রশাসনের এই নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ ও হিন্দুবিরোধী আচরণের প্রতিবাদে এবছর তেহট্টের সমস্ত হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২৬টি জগদ্ধাত্রী পূজা বয়কট করেছে। এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তেহট্টে গিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করলে স্থানীয় হিন্দু জনতার দ্বারা শুধু ধিক্কারই পেয়েছেন।

## বসিরহাট উত্তাল
# ধর্ষিতা নাবালিকার মৃত্যু

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের চাঁদাপুকুর গ্রাম। ঐ গ্রামের চাঁদাপুকুর গার্লস স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্রী অদিতি ভট্টাচার্য। গত ৬ই নভেম্বর অদিতি নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজ করেও কোন সন্ধান তার পাওয়া যায়নি। ৯ই নভেম্বর অদিতির মৃতদেহ প্রতিবেশী আসগার আলি মোল্লার বাড়ির পিছনের পুকুর থেকে পাওয়া যায়। আসগার আলি মোল্লা ঐ অঞ্চলের একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—দীর্ঘদিন ধরে সে নারী পাচারের সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে সাহায্য করে। এই কাজে তার সঙ্গে তার স্ত্রীও জড়িত।

অদিতি নিখোঁজ হবার পর তার বাবা বসিরহাট থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে। তিনদিন পর মেয়েটির মৃতদেহ আসগার আলি মোল্লার বাড়ির পিছনের পুকুরে ভেসে ওঠে। পুলিশের বয়ান অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তি মেয়েটির গলা টিপে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দেয়। কিন্তু এলাকার হিন্দুদের স্থির বিশ্বাস অদিতিকে খুন করার আগে দুষ্কৃতিরা তাকে ধর্ষণ করেছিল। ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এলাকার মুসলিম গুণ্ডাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। জনতা খুন ও ধর্ষণের মূল পাণ্ডা আসগার আলির বাড়ির দিকে এগোলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষপর্যন্ত পুলিশের সব বাধা অতিক্রম করে সাধারণ মানুষ আসগার আলির বাড়িতে গিয়ে তাকে ও তার পরিবারের লোকজনদের প্রচণ্ড মারধোর করে এবং বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এই সময় এস.ডি.পি.ও. আনন্দ সরকার ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। তিনি উত্তেজিত হিন্দু জনতাকে আশ্বাস দেন যে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এস.ডি.পি.ও.-র আশ্বাস পেয়ে জনতা অদিতির বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পুলিশকে নিয়ে যেতে দেয়। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা থাকায় থানা থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

# ছটপূজায় সংহতির হ্যাণ্ডবিল নিয়ে উত্তেজনা

এবারে ছটপূজা উপলক্ষে হিন্দিভাষীদের জন্য সংহতির পক্ষ থেকে হিন্দিতে একটি লিফ্‌লেট প্রকাশ করে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় বিলি করাকে কেন্দ্র করে বহু স্থানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

ছট্‌পূজা উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার খড়দহে হিন্দু সংহতি-র কর্মীদের স্টেশন চত্বরে দেওয়া বইয়ের স্টল থেকে বিলি হওয়া হ্যাণ্ডবিল হিন্দিভাষীদের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগায়। ঐ স্টলের কিছু দূরে একটি মসজিদ আছে। হ্যাণ্ডবিল মুসলমানদের হাতে পৌঁছলে তারা মসজিদ সংলগ্ন হিন্দুদের দোকানে ভাঙচুর করে ও জিনিসপত্র ফেলে দেয়। হ্যাণ্ডবিলকে কেন্দ্র করে তারা গালিগালাজ করতে থাকে। খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হলে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বচসা বাধে ও হাতাহাতি হয়। মুসলমানরা বোমা, ছোরা, নিয়ে হিন্দুদের মারার হুমকি দিতে থাকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাজির হয়। পুলিশের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা মিটে গেলেও, হিন্দু সংহতি হিন্দি লিফলেট বিলি করে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছে বলে মুসলমানরা অভিযোগ জানায়। খড়দহ থানার ও.সি. বিশাল জয়সোয়ালকে থানায় ডেকে পাঠায় ও তার বাড়িতে দু-তিনবার পুলিশ যায়। বিশালকে না পেয়ে পরিবারের লোকজনকে হুমকি দেয়। খড়দহ থানা থেকে হিন্দি হ্যাণ্ডবিলকে কেন্দ্র করে সংহতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফোন আসে। 'আপনারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন কেন?' এটাই ছিল পুলিশের বক্তব্য। সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ পুলিশকে জানান, এই হ্যান্ডবিলে সাম্প্রদায়িক প্ররোচনামূলক কিছুই লেখা নেই, পুলিশ ইচ্ছা হলে এর বিরুদ্ধে কেস করতে পারে।

# হিন্দু সংহতির পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হবে আরও উৎসাহের সঙ্গে

**এবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী আরো বড় করে হবে। মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে গতবছর ১৪ই ফেব্রুয়ারী মমতা ব্যানার্জী প্রচণ্ড ও অবৈধ বাধা সৃষ্টি করেও রুখতে পারেননি। তাতে সাধারণ মানুষ হিন্দু সংহতি নেতৃত্বের অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পেয়েছে। সংহতি কর্মীদেরও মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেদের এলাকায় তারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবসে সংহতি কর্মী ও সমর্থকদের অনুপ্রেরণা যোগাতে এবছর আসছেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বেলজিয়ামের ডঃ কোয়েনরাড্ এল্‌স্ট। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন আমেরিকার ডঃ রিচার্ড বেনকিন, লন্ডনের ডঃ গৌতম সেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শরদিন্দু মুখার্জী, পূজ্যপাদ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী, পূজ্যপাদ স্বামী তেজসানন্দজী এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।**

**সংহতি কর্মীরা সারা বছর ধরে নিজের নিজের এলাকায় যে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, হিন্দু সমাজকে নিরাপত্তা দানে কিছুটা হলেও সমর্থ হয়েছে—এসবের পরিচয় পাওয়া যাবে এবছরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে।**

## আমাদের কথা

# জয় আমাদের নিশ্চিত

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, বকরিদ্, জগদ্ধাত্রী পূজা—কোনটাই বাদ গেল না। সংহতি দপ্তরে এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই প্রচুর সংখ্যায় হিন্দু-মুসলিম গণ্ডগোলের খবর এসেছে। এন্টালি ও তেহট্টের ঘটনা অনেক বড় আকার ধারণ করেছিল। তেহট্টে ২৬টি জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ হয়েছে এবং একজন হিন্দুর প্রাণ গিয়েছে পুলিশের গুলিতে। এন্টালিতে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙা হয়েছে, তার উপর দশজন হিন্দুকে ১৫ দিন জেল খাটতে হয়েছে। কলকাতার বেলেঘাটা ও নদীয়ার শান্তিপুরে ঠাকুরের প্রতিমার দোকানে রাত্রের অন্ধকারে প্রচুর ঠাকুর ভাঙা হয়েছে। এছাড়াও এত ঘটনার খবর এসেছে যে হিসাবই রাখা যায়নি। কিন্তু বেশ কিছু স্থান থেকে প্রতিরোধের খবরও এসেছে। হিন্দুরা অনেক জায়গাতেই সোচ্চারে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছে। ভবিষ্যতে আরও করবে। বাংলার হিন্দুরা দ্রুত বুঝতে পারছে যে সরকার ও প্রশাসন নিরপেক্ষ বিচার করবে না। সরকার মুসলিম ভোটের লোভে ও পুলিশ প্রশাসন হিংসার ভয়ে মুসলমানের সমস্ত অবৈধ ও হিন্দু বিরোধী কাজকে প্রশ্রয় দেবে। তাই হিন্দুকে নিজের রক্ষার ভার নিজের হাতেই তুলে নিতে হবে। তাই নিচ্ছে।

সমাজের উপরতলায় বসে থাকা অনেক ব্যক্তি মনে করেন, হিন্দুরা এতই বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত যে তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। এদের ধারণা ভুল। এরা হিন্দু সমাজ বলতে শুধু উপরতলার দশ শতাংশ হিন্দুদেরকেই বোঝেন। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের শক্তি সম্বন্ধে এদের কোনো ধারণা নেই। ১৯৪৭ সালে দুটি কারণে এই শক্তি কাজে লাগেনি। প্রথমতঃ, মানুষ অপ্রস্তুত ছিল এবং ভাবতেই পারেনি সত্যি সত্যি দেশটা ভাগ হবে। দ্বিতীয়তঃ, তখন সামাজিক নেতৃত্ব উচ্চবর্গের হাতে ছিল। সেই নেতৃত্ব নিজেদের কাপুরুষতার জন্য সমাজকে লড়াইয়ের আহ্বান জানায়নি। এবার নিশ্চিতভাবে প্রথম কারণটা নেই। বাঙালি হিন্দুর স্মৃতিতে ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৪, ৬০, ৬৪, ৭১, ৯২, ২০০১-এর হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার কথা মুছে যায়নি। বাঙালি হিন্দুর স্মৃতি খুব দুর্বল নয়। বখতিয়ার খলজি থেকে শুরু করে লম্পট সিরাজদৌল্লা পর্যন্ত (১৭৫৭) মুসলিম শাসনের বীভৎসতা বাঙালি হিন্দুর মন থেকে পরবর্তী ১০০ বছরেও একটুও মুছে যায়নি বলেই ১৮৫৭-র ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে তারা অংশগ্রহণ করেনি। এটা নিশ্চিতভাবে বাঙালি হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতার পরিচয়। পরবর্তী দিনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ না করা থেকেই বাঙালি হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি যে সঠিক ছিল তা প্রমাণিত হয়। মুসলিম প্রধান বঙ্গপ্রদেশ থেকে শত শত বাঙালি হিন্দু শহীদ হয়েছেন। কিন্তু একজনও মুসলিম শহীদ হয়নি। মুসলিম প্রধান অখণ্ড পাঞ্জাবেরও কাহিনী সেই একই। এই কটু সত্যের উপলব্ধি সাধারণ বাঙালি হিন্দুর আছে। তাই দুধের উপর সরের মত আজকের বাঙালি বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকে দেখে সরের নীচে বৃহত্তর বাঙালি হিন্দু সমাজের উত্তাপকে অনুভব করা যাবে না। আমরা ময়দানে আছি, তাই আমরা জানি যে এবার আর '৪৭ এর পুনরাবৃত্তি বিনা লড়াইয়ে হবে না। শুধু উচ্চবর্গীয় বুদ্ধিজীবিদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ তাঁরা নেতৃত্বের জায়গাটা ছেড়ে দিন। হিন্দু সমাজের সংগ্রামী অংশের যুবকদেরকে সেই স্থানটা গ্রহণ করতে দিন। তাহলেই জয় আমাদের নিশ্চিত।

## ভয়ঙ্কর বিপদকে ঢাকা দেওয়ার আত্মঘাতী অপচেষ্টা

# জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে সরকারের মিথ্যাচার

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের উইকিলিকস্ ভারত সম্বন্ধে আবার একটা বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেছে যা যথারীতি ভারতের মিডিয়া গুরুত্ব দেয়নি। তথ্যটি হল---২০০১ সালের জনগণনায় ভারতে মুসলমানের সংখ্যা বাস্তবের থেকে কম করে দেখানো হয়েছে। ২০০১ সালের জনগণনার পর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন সেনশাস কমিশনার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখানো হয়েছিল দেশে মুসলমানের মোট জনসংখ্যা ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৪০। তখন ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ১০২ কোটি ৮৬ লক্ষ ১০ হাজার ৩২৮। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১৩.৪ শতাংশ মুসলিম।

কিন্তু উইকিলিক্স্ জানিয়েছে যে, আমেরিকার কূটনৈতিক সূত্র ভারতে তাদের বিভিন্ন সোর্স থেকে জেনেছে যে ওই সময় ভারতে মুসলিমের প্রকৃত সংখ্যা ছিল ১৬ কোটি থেকে ১৮ কোটির মধ্যে। অর্থাৎ ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম জনসংখ্যা ২ কোটি থেকে ৪ কোটি কম করে দেখিয়েছে। সরকারই যেখানে সংখ্যা গোপন করছে, সেখানে সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন। যদি কম সংখ্যাটা ধরা হয়, অর্থাৎ ১৬ কোটি, তাহলে তখনই মুসলিম ছিল ১৫.৬ শতাংশ। আর ১৮ কোটি মুসলিম হলে তাদের সংখ্যা ছিল ১৭.৫ শতাংশ। আর দুটোর মাঝামাঝি গড় ধরলে হয় ১৬.৫ শতাংশ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিমের সংখ্যা বাস্তবের থেকে ৩ শতাংশ কম করে দেখিয়েছিল। স্পষ্টতই এর দ্বারা জনগণকে মুসলিমের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবণতা বিপজ্জনক। ২০০১ সালে জনগণনা এবং তার রিপোর্ট প্রকাশের সময় কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. সরকার ক্ষমতায় ছিল।

আশঙ্কা করা যায় যে বর্তমান কংগ্রেস সরকারও সেই একই অপকীর্তি করবে এবং দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতিকে বিপজ্জনক দিকে ঠেলে দেবে। অনেকের আশঙ্কা যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ২০১১ সালের সেনশাস রিপোর্টের ধর্মীয় পরিসংখ্যানটা পুরোটাই চেপে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সারা দেশে হিন্দুর থেকে মুসলমানের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। যেমন ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ দশকে হিন্দুর বৃদ্ধির হার ছিল ২২.৭ শতাংশ, মুসলিমের বৃদ্ধির হার ছিল ৩২.৯ শতাংশ। ১৯৯১ থেকে ২০০১ দশকে হিন্দুর বৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৩ শতাংশ, মুসলিমের বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৫ শতাংশ। অর্থাৎ দুটি দশকেই হিন্দুর থেকে মুসলমানের বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ বেশি ছিল।

মুসলিমের এই অত্যাধিক সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সরকারের তা গোপন করার চেষ্টা—এ দুটির যুগ্ম পরিণাম কি খুব ভাল হবে? পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি তো আরও খারাপ। ২০০১ সালের জনগণনায় এরাজ্যে মুসলিমের সংখ্যা দেখানো হয়েছিল ২৫.২ শতাংশ। সেটাকে ভিত্তি করে বর্তমানে এরাজ্যে মুসলিমের সংখ্যা এস্টিমেট করা হয় ২৭ বা ২৮ শতাংশ। কিন্তু বাস্তবে তা ৩০ শতাংশের কম বলে কেউই মনে করেন না। সারা ভারতে জম্মু কাশ্মীরের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে। তাই এ আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক যে পশ্চিমবঙ্গও কি কাশ্মীরের পথে?

[সংবাদ সূত্র ঃ Times of India, 4 Sept. 11]

# বালাসাহেব ঠাকরে-কে সংহতির শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

বীর সৈনিক, হিন্দু বীর্যের প্রকৃত পরিচায়ক শিবসেনা প্রধান বালাসাহেব ঠাকরে চলে গেলেন। তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত ২০শে নভেম্বর হিন্দু সংহতির বনগাঁ শাখার উদ্যোগে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে এক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি ৪টার সময় বনগাঁ টাউন হলের সামনে থেকে প্রায় চার শতাধিক হিন্দু সংহতির কর্মীর উপস্থিতিতে শুরু হয় এবং যশোর রোড ধরে বনগাঁ শহরের বিভিন্ন জায়গায় পথ পরিক্রমা করে। আমেরিকায় বাসকারী ভারতীয় হিন্দু শ্রী প্রদীপ পারেখ বালাসাহেব ঠাকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। স্মরণ সভায় উপস্থিত হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী শ্রী অজিত অধিকারী ও শ্রী সুজিত মাইতি প্রভৃতি শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় সংহতির পক্ষ থেকে বালাসাহেব ঠাকরেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

# মগরাহাটে প্রাণ গেল নিরীহ হিন্দুর

গত ১৫ই নভেম্বর দঃ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার অন্তর্গত নিতাই হালদার মারা গেলে তার দেহ দাহ করার জন্য জয়নগর থানার দুর্গাপুরের শ্মশানে নিয়ে আসা হয় ১০টা নাগাদ। প্রায় শতাধিক লোক এই যাত্রায় ছিল, যাদের একজন হল সুকমার হালদার (বয়স ৫০)। সেই দাহকার্যে যোগ দিতে মোটর সাইকেলে করে আসছিল সুকুমার বাবুর ছেলে দেবাশিষ হালদার (২৪)। শ্মশানে ঢোকার মুখে একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে দুজন সাইকেল আরোহী দেবাশিষের বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাক্রমে এই সাইকেল আরোহী দুজন ছিল মুসলমান। উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয় এবং মুসলমান দুজন ক্ষমা চেয়ে দোষ স্বীকার করে চলে যায়। এখানেই সব মিটে গিয়েছিল।

কিন্তু পেট্রোল পাম্পের মালিকের ছেলে আবুল ফারুক ওরফে পিন্টু খাঁন, মুসলমানের হিন্দুর কাছে মাথা নিচু করে ক্ষমা চাওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। তারমধ্যে ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব জেগে ওঠে, তাই ফোন করে ১৫-২০ জন মুসলমান ছেলেকে ডেকে নেয় এবং জাত তুলে হিন্দুদের গালাগালি দিতে থাকে। আর এর প্রতিবাদ করলে দেবাশিষ ওরফে বাপিকে কলার ধরে পেট্রোল পাম্পের মধ্যে নিয়ে আসে আর মেরে ফেলার হুমকির সাথে সাথে বেলচার খোলা হাতল দিয়ে আঘাত ও লাথি-ঘুষি মারতে থাকে। নিকটবর্তী শ্মশান থেকে দেবাশিষের বাবা সুকুমার হালদার তা দেখে ছুটে আসেন, তখন ফারুক ও তার দলবল সুকুমার বাবুর পরিচয় পেয়ে তাকে মৃত্যুর হুমকির সাথে নির্মমভাবে একাধিকবার আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ভীত শ্মশান যাত্রীরা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিকটবর্তী জয়নগর সত্যজিৎ নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে দক্ষিণ বারাসাতের নিবেদিতা নার্সিং হোমে নিয়ে আসা হয়। সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ করে দিয়ে ঐদিন বিকালে সুকুমার বাবুর মৃত্যু হয়।

সুকুমারবাবুর মৃত্যু হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তারা সমবেতভাবে জয়নগর থানায় একটি অভিযোগ করলে সেখানে একটি সাধারণ ডায়রি করে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এতবড় একটা ঘটনায় কোন এফ.আই.আর. না করে জয়নগর থানা শুধু একটা জি.ডি. করলো তা বোধগম্যের বাইরে। আরও আশ্চর্যের এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, সামান্য থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়নি। এই হিন্দু নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে স্থানীয় হিন্দুরা দুপুরবেলায় কুলপী রোড অবরোধ করে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, উক্ত শ্মশানের দীর্ঘদিনের কালীপূজা আবুল ফারুক ও তার দলবল এই বছর জোর করে বন্ধ করে দেয় এবং শ্মশানের সামনের বিস্তৃত অংশ জবরদখল করে ব্যবসা করছে। আশ্চর্য ব্যাপার হল ঐ অবৈধ জবরদখলকৃত স্থানে পরিবেশ দপ্তর কি করে গাড়ির দূষণ পরীক্ষাকেন্দ্রের ছাড়পত্র দেয়।

# হিন্দু সংহতির বিভিন্ন কর্মসূচী

## বিজয়া সম্মেলন

দেবী দুর্গার অসুরকে নিধন করে পৃথিবীকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে মর্ত্যে আগমন ঘটে। অসুর বধ করে মা দুর্গার যে জয়লাভ, তাই-ই হল বিজয় উৎসব। তাই বিজয়ার অর্থ বিসর্জন নয়, জয়ের উৎসব। দশমীর দিন এই বিজয় উৎসবই বিভিন্ন জেলায় পালন করলো হিন্দু সংহতির কর্মীরা। কোথায় হয়েছে শস্ত্রপূজা, আবার কোথাও সংহতির কর্মীরা একজোট হয়ে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে জয়ের শপথ নিয়েছে। হুগলী জেলার ফুরফুরা, বারুইপুরের কুন্দরালী, হাসনাবাদ, চারঘাট, দেগঙ্গা, হোটর, বাগনান সহ আরও অনেক জায়গায় বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতির হার ছিল চোখে পড়ার মতো।

## বস্ত্র বিতরণ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তি থানার হাজরা পাড়াতে বাৎসরিক মনসা পূজা উপলক্ষে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বালা সাহেব ঠাকরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উপস্থিত জনতা উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী বিকর্ণ নস্কর, প্রতাপ হাজরা, হারান মণ্ডল প্রমুখ।

# পুঞ্চে প্রাণসঞ্চার ঃ আমার শিক্ষালাভ (৩)

**তপন কুমার ঘোষ**

রাত্রি হয়ে গেছে। এরপর যাত্রীদের দশনামী আখড়া থেকে নির্ধারিত নিবাসস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। পুঞ্চ ছোট্ট শহর। তাও তো বিভিন্ন দিকে পাঠাতে হবে। তাছাড়া জঙ্গীদের লুকিয়ে থাকার আশঙ্কা সর্বত্র। তাই প্রত্যেক দলের সঙ্গে কয়েকজন করে স্থানীয় ছেলে দেওয়া দরকার। আমার পুরানো সোনাখালির শিক্ষা ছিল। তাই কোন পরিচয় ছাড়াই, নাম পর্যন্ত না জেনে, স্থানীয় ছেলেদেরকে গন্তব্যস্থান বলে দিয়ে এক একটা গ্রুপের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। মাত্র দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে পরিবেশটা এমন পাল্টে গেল, যেন সমস্ত কাজের বোঝা হালকা হয়ে গেল। আমিও হালকা হয়ে গেলাম। মনে হল যেন হাওয়ায় ভাসছি।

পরের দিন বেশ সকালে সব যাত্রীরা তৈরি হয়ে আবার আখড়ায় চলে এসেছে। তাদের জন্য তৈরি গরম চা আর বড় বড় টোস্ট বিস্কুট। শহরবাসীরাও অনেকে এসে গিয়েছে। যাত্রীদেরকে আমরা উৎসাহিত করছি—যাও মার্কেকটা ঘুরে এস তাড়াতাড়ি। মন্দিরের দিকে রওনা দিতে হবে। আবার মাঠে জমা হওয়া। বাসে চেপে বুঢ়া অমরনাথ মন্দিরের দিকে রওনা। এ রাস্তা আরও দুর্গম। কনভয়ের সামনে পিছনে তো পুলিশ জীপ আছেই। রাস্তার দুধারেও উল্টোদিকে মুখ করে রাইফেল উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। ও, বলতে ভুলে গেছি। আমাদের যাত্রার আগে আর্মির মাইন ডিটেক্টর বিশাল গাড়ি এই ২৫ কিমি. রাস্তা পরীক্ষা করেছে—বদমাসরা রাত্রিবেলায় কোথাও মাইন পুঁতে রেখে গিয়েছে কিনা। আর্মির ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরেই আমাদের যাত্রা শুরু হল পুঞ্চ শহর থেকে মন্ডীর উদ্দেশ্যে। এই ২৫ কিমি যাওয়ার পথে অল্প কিছু হিন্দু ও শিখ এলাকা পড়ে। আর সবটাই মুসলিম বসতি। আমাদের এই যাত্রা সকলের কাছেই এক আশ্চর্য্য ঘটনা।

বাবা বুঢ়া অমরনাথ মন্দিরে গিয়ে পৌঁছানোর পর বি এস এফ মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে সকলকে মন্দির চত্বরে ঢোকাল। সাহসী ও উদ্যমীরা পুলস্তী নদীতে ঝাঁপালো। তারপর সকলে মন্দিরের সামনে লাইন দিল দর্শন ও জল ঢালার জন্য। যাত্রীদের কণ্ঠে হর হর মহাদেব, বাবা বুঢ়া অমরনাথ কি জয়-ধ্বনি আশপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এর সঙ্গে মিশল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। সমস্ত এলাকাটা গম গম করতে লাগল। বহুদিন পর এরকম পরিবেশ তৈরি হল।

পূজার পরে মন্দিরের ব্যবস্থায় লুচি-আলুরদম খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেদিকে কারো মন নেই। সবাই চারিদিকটা ঘুরে দেখতে চাইছে। মাত্র কয়েকঘণ্টা সময় পাবে। তাই যেন চোখ দিয়ে শুষে নিতে চাইছে দৃশ্যগুলোকে। বেশ কয়েকজন আবার মন্দিরের ভিতরে গভীর ধ্যানে বসে গিয়েছে। এই হিমালয় তো মহাদেবেরই বাসস্থান। তাই বাড়ী থেকে এতদূরে এসে এ সুযোগ তারা ছাড়তে চায় না। শংকর ভগবানের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে যে।

আর্মি ক্যাম্প, পুলস্তী নদী, চোখ জুড়ানো সবুজ পাহাড়, কাঁটাতারের বেড়া। যুবকদের চোখ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে—কোথাও যদি পাকিস্তানী জঙ্গীদের দেখা যায়। তাহলে বোধহয় চিবিয়ে খাবে। সব মিলে আমি যেন একটি সামূহিক মনের (collective mind) ভাষা পড়তে পারলাম। সে ভাষাটা হচ্ছে এই— 'তোরা শয়তানের বাচ্চারা, এই জায়গাটাকে তোরা আমাদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলি। আজ দেখ, তোদেরকে হারিয়ে আমরা এখানে এসেছি। দেখি তোরা কি করতে পারিস।' সকলের মনের মধ্যে বিজয়ী হওয়ার অনুভূতি। উপনিষদের মন্ত্র 'সংবো মনাংসি জানতাম্' যেন আমি প্রত্যক্ষ করলাম।

তারপর তাড়া লাগিয়ে বাসে তুলতে বেশ কষ্ট হল। বেলা প্রায় ১২টা। কনভয় রওনা হল। ফেরার পথে আর পুঞ্চ শহরে ঢোকার দরকার নেই। পুলস্তী নদীর উপরেই আর্মির একটি ব্রিজ পেরিয়ে জম্মুর দিকে রওনা। তাদেরকে বিদায় জানিয়ে আমি আমার দলবলকে নিয়ে ফিরে গেলাম পুঞ্চ শহরে। সেদিন বিকালেই তো পরের দলটা আসবে। তার জন্য প্রস্তুতি করতে হবে।

বেলা ১টা নাগাদ পুঞ্চ শহরে ফিরলাম। দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাস তো নেই। তাই মার্কেটে বের হলাম লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে। মনে হল কিরকম যেন পাল্টে গিয়েছে। আপ্যায়নের পরিমাণটা আগের তুলনায় অনেকটা বেশী। সবাই আমার সঙ্গে কথাও বলছে একটু বেশী সম্ভ্রমের সঙ্গে। কারণটা বুঝতে একটু সময় লাগল। সকলে মনে করছে—আমিই এতগুলো লোককে পুঞ্চে এনে দিয়েছি। পুঞ্চকে দেশের সঙ্গে যেন আমিই জুড়ে দিয়েছি। চা-নিমকি-জলখাবারের দোকানে কিছু খেয়ে দাম দেওয়ার আগেই অচেনা কেউ এসে দাম দিয়ে দিচ্ছে।

এল দ্বিতীয় বিকাল। ৪টে থেকেই মাঠে লোক জমা শুরু হয়ে গিয়েছে। পাঁচটার সময় অনেক ভিড়। কারো তর সইছে না। পুলিশকে গিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করছে-কত দূর। ত্রিপল খাটিয়ে টেবিল সাজিয়ে হয়ে গিয়েছে চা-নিমকির ব্যবস্থা। সরবৎ তো আছেই। কোনটাই আমরা ব্যবস্থা করিনি। সাড়ে পাঁচটার সময় বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল। পুলিশের পাইলট কারের হুইসিলের আওয়াজ। জনতার মধ্যে ঢেউ বয়ে গেল। বেজে উঠল ঢোল। পাইলট কারের পিছনে বাসের সারি দেখা গেল। একটু বয়স্করা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আর ছোটদের প্রবল উত্তেজনা বাসের সংখ্যা গোনায়। সেই কচি মুখগুলো আমার এখনও মনে পড়ছে। আর যুবকরা ব্যস্ত বাসগুলোকে ঠিকভাবে মাঠে লাইন করে পার্কিং করাতে। গোনা শেষ হল ২৩-এ। অর্থাৎ ২৩টি বাস ভর্তি সারা দেশের যুবকরা এসেছে। সম্ভবতঃ আগের দিনের ফিরে যাওয়া যাত্রীদের কাছে খবর পেয়ে এদিন যাত্রীদের মুখে চোখে অনিশ্চয়তার ভাব অনেকটাই কেটে গিয়েছে। যাত্রী ও স্থানীয়দের কণ্ঠে সমবেত স্বরে ধ্বনি উঠল ভারতমাতা কী জয়। জয় শ্রীরাম। যেন তারা পাহাড়গুলোকে পাড় করে পাকিস্তানে এই আওয়াজ পৌঁছে দিতে চাইছে।

এর মধ্যেই আছে মেঘ, বৃষ্টি। কেউ পরোয়া করছে না। রাতের কারফিউ হয়ে গেল ঢিলে। দশনামী আখড়াতে কে যেন এসে ডেক ও বক্স মাইক লাগিয়ে দিয়েছে। বাজছে লতা মঙ্গেশকরের 'এ মেরে ওয়াতন কে লোগোঁ, জরা আঁখ মে ভরলো পানি, জো হুয়ে শহীদ হ্যায় উনকী, জরা ইয়াদ করো কুরবানি।' যুবকদের ধীর তালে নাচ, তার সঙ্গে আবেগ। আবার অন্য জোস্ওয়ালা দেশভক্তির গানের সঙ্গে উদ্দাম নাম। আশপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বয়স্কদের চোখে মুখে এক অদ্ভুত তৃপ্তি। যেন অবিশ্বাসের একটা দীর্ঘ অধ্যায়কে পার করে আবার তারা বিশ্বাসকে ফিরে পেয়েছে। এবং যুবকরাই এই বিশ্বাসকে ফিরিয়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা মায়েদের মুখেও সেই আনন্দের ভাব ফুটছে। কিন্তু সেটা একটু অন্যরকম। সেখানে ওই পুরুষদের মত দুই অধ্যায়ের দোলাচল নেই। তারা তাদের সন্তানদের প্রতি কোনদিন বিশ্বাস হারায়নি। তাই তাদের আনন্দ নদীর স্বাভাবিক স্রোতের মত ও ছায়াহীন।

আমি তখন বহুজনের আকর্ষণের কেন্দ্র। অনেকেই আমাকে এসে কিছু পরামর্শ দিতে চায়, কেউ বা কিছু জানতে চায়, আর কেউ কাজ চায়। আমি চেষ্টা করছি নিজেকে একটু আড়াল করতে। এদিন ১২০০ যাত্রী। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি কাজ সব আপনি থেকে গড় গড় করে হয়ে যাবে। কোন বৈঠক, কোন যোজনা কোন দায়িত্ব বন্টন—কিচ্ছু লাগবে না। গোটা পুঞ্চ শহর কাজকে আপন করে নিয়েছে। যাত্রীরা এখন পুঞ্চের অতিথি, আমার নয়। একটু আড়াল খুঁজছিলাম সমস্ত ঘটনাবলীকে একটু তলিয়ে দেখার জন্য। যুবকদের ওই উদ্দাম নৃত্য, দেশভক্তির গান, পাকিস্তানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ভঙ্গি, আর বয়স্ক মানুষদের মুখমণ্ডলে স্বস্তির চিহ্ন—এসব দেখে মনে ভেসে উঠছিল একটাই কথা—যৌবনের কোন বিকল্প নেই। আমাদের এই পোড়ার দেশে যৌবনের কোন স্বীকৃতি নেই। দাড়ি সাদা না হলে এদেশে ঋষিও হয় না, বিশ্বকবিও হয় না। ৭০ বছরের কম বয়সে প্রধানমন্ত্রী হলে তাকে অনভিজ্ঞ ভাবা হয়। কংগ্রেসের যে বৃদ্ধ নেতারা ইন্দিরা গান্ধীকে কম বয়সে (৪৯ বছর) প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়েছিলেন, তাঁরা ইন্দিরার যৌবন, উদ্যম ও সাহসকে স্বীকৃতি দিয়ে বসান নি। আদরের ইন্দু-গুড়িয়াকে হাতে রাখা যাবে এই ধান্দায় বাসিয়েছিলেন। এদেশে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতারাও অবসর গ্রহণ করেন না, ধার্মিক ও সামাজিক সংস্থার কর্তাব্যক্তিরাও অবসর গ্রহণ করেন না। যৌবনকে স্বীকৃতি দেওয়া হলে এদেশে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত।

বাবা বুঢ়া অমরনাথ যাত্রার গাড়ি গড়গড়িয়ে চলতে থাকল। সরকারি সহযোগিতাও আসতে থাকল। সরকারী অফিসারদের সঙ্গে ডীল করতে ধনঞ্জয় পাঠক আমার থেকেও বহুগুণে দক্ষ। সরকারের ১০টা 'না'-এর মধ্যে ৯-টাকে 'হ্যাঁ' করানোর ক্ষমতা তার আছে। ধনঞ্জয়জী সুপার অফিসার। আদেশ দিতে অভ্যস্ত। সমস্ত পুঞ্চ শহরটা হয়ে গেল আমার অধীন, আর প্রশাসন ও সংস্থাগুলি ধনঞ্জয়জীর হাতে। এর মধ্যে একজনের কথা না বললেই নয়। পুঞ্চ পৌরসভার চেয়ারম্যান সরদার রাজেন্দ্র সিং। তিনি কংগ্রেসের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন সারাদিন। সব কাজ। জলের গাড়ি, সাফাই কর্মচারী এসব তো করছেনই, অন্য সব কাজও। একদিন বৃষ্টিতে কাদা হয়ে গেছে। আমরা আলোচনা করছি শুকনো মাটি, বিচালি দিতে হবে। সব থেকে আগে হাতে করে মাটি এনে ফেলা শুরু করে দিলেন রাজেন্দ্রজী। আর এস এসও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। রোজ রাতে দশনামী আখড়ায় প্রায় ২০০০ জনের খাবার তৈরি হচ্ছে। কিন্তু রুটি ওখানে করা যাচ্ছে না। অথচ উত্তর ভারতের যাত্রীদের জন্য, বিশেষ করে দিল্লী পাঞ্জাব হরিয়ানার যাত্রীদের জন্য রুটি হলে ভাল হয়। আর এস এস দায়িত্ব নিল। শহরে ও কাছাকাছি কিছু গ্রাম থেকে বাড়ি বাড়ি থেকে রোজ ১০০০ আটার রুটি সংগ্রহ করা কাজ অত্যন্ত সুচারুভাবে সংঘের স্বয়ংসেবকেরা করতে লাগলেন এবং ভোজন পরিবেশনে পুঞ্চের যুবকদের সাথে উৎসারে সঙ্গে হাত লাগালেন।

গোটা শহরে যেন প্রাণের ছোঁয়া লাগল। আমি আর ধনঞ্জয়জী চিন্তা করলাম—রাজনৈতিক দলের ভেদাভেদ ভুলে সব দলের হিন্দুরা এগিয়ে এসেছে। সত্যিকারের একটা হিন্দু ঐক্য তৈরি হচ্ছে। আমরা, মানে বজরং দল উপলক্ষ হয়েছি। কিন্তু সব জাতি বা সব শ্রেণীর হিন্দু আসছে তো? খোঁজ নিয়ে জানা গেল—এখানে যাদেরকে দলিত বলা হয়, এরকম দুটি পাড়ার হিন্দুরা একটু কম আসছে এবং খাবার বিতরণেও অংশগ্রহণ করছে না। আমি আর ধনঞ্জয়জী ওই দুটো পাড়ায় গেলাম এবং ওখানকার বন্ধুদেরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলাম। এর ফল ভাল হল। তারা বেশি করে আসতে লাগলেন এবং ওদের যুবকদেরকে আমরা সংকোচ কাটিয়ে বিতরণের কাজে লাগিয়ে দিলাম।

আর একটা জিনিস শুরু হল। প্রথম দু'দিন ভোজনের খরচ দশনামী আখড়া কর্তৃপক্ষই করেছিলেন। তারপর আমাদের কাছে আবেদন আসতে থাকল যে একদিনের খাওয়ানোর দায়িত্ব, ওখানে ভাণ্ডারা বলে, এক একজন নিতে চায়। আমাদের তো আপত্তি থাকার কোন কারণই নেই। কিন্তু আবেদনকর্তা বেশি, দিন কম। তাই যাদের ভাগে রাতের ভোজন পড়ল না, তাদেরকে সকালের চা-বিস্কুটের দায়িত্ব দেওয়া হল। আবার বিকালে মাঠে স্টল লাগানোর জন্যও আবেদন এল। অনুমতি দিলাম। মাঠে চা, সরবৎ, সিঙ্গারা, জিলিপি, হালুয়া-র স্টল লেগে গেল। ব্যবস্থা এবং আন্তরিকতা আগত যাত্রীদেরকেও আপ্লুত করল। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসে জীবনের মধুরতম স্মৃতি নিয়ে তারা ফিরতে লাগল।

সারা দেশে জেহাদী সন্ত্রাসের কালো ছায়ায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের হাতে বারবার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অপমানিত হতে হতে একেবারে পাকিস্তানের এই পুঞ্চে এসে যাত্রী যুবকদের যে অনুভূতি হল, তা যেন ভালোবাসা আন্তরিকতা দেশপ্রেম রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও জাতীয় একাত্মতার এক অপূর্ব মিশ্রণ। এ তাদের লাইফটাইম অভিজ্ঞতা। পরে জেনেছি অনেকেই ফিরে গিয়ে নিজ নিজ স্থানে বাবা বুঢ়া অমরনাথের নামে সংস্থা তৈরি করেছে। দিল্লীতে বুঢ়া অমরনাথ যাত্রা সেবা সমিতি নামে সংস্থা করে প্রতি বছর যাত্রীদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ...)

# ঠাকুরনগরে সংহতির জনসভা

গত ২৫শে নভেম্বর হিন্দু সংহতি-র ডাকে উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগরে স্টেশন সংলগ্ন মাঠে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার বিষয় ছিল, 'পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের ভারতে নাগরিকত্ব দান এবং গরু পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য ও অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের হামলায় সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো দূরবস্থা।' রাজনৈতিক দলগুলোর নীরবতা ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার ফলে যখন গ্রামের অসহায় হিন্দুরা কি করবে তা বুঝতে পারছেন না, তখনই হিন্দু সংহতির মঞ্চ থেকে এই প্রতিবাদী আহ্বান।

হিন্দু সংহতি-র বিশিষ্ট কর্মী বিকর্ণ নস্কর তার বক্তব্যে প্রশ্ন তোলেন হিন্দুদের যে কোন পূজার জন্য প্রশাসনের অনুমতির প্রয়োজন, অথচ মুসলিমরা ঈদের নামাজ পড়া বা মহরমের মিছিলের জন্য প্রশাসনের কোন অনুমতি নেয় না। তিনি গরুপাচারকারীদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নীরবতার কারণ কি তার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সংহতির বনগাঁ শাখার কর্ণধার অজিত অধিকারী তাঁর বক্তব্যে বলেন, হিন্দু ধর্মরক্ষায় বড় বড় হিন্দু সংগঠন ও তার সাধু-সন্ন্যাসীরা এগিয়ে আসছেন না। তাঁরা ব্যক্তি স্বার্থের মধ্যে ডুবে রয়েছেন, দেশ-ধর্ম রক্ষায় তাঁরা নিষ্ক্রিয়। তাই আজ সাধারণ হিন্দুদের এগিয়ে আসতে হবে হিন্দু ধর্ম রক্ষায়। সংহতি সভাপতি তপন কুমার ঘোষ বলেন, মুসলিম তোষণের বীজ বহু সুদূর থেকেই নিহিত। ১৯২৩ সালে তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ কর্পোরেশনে মুসলিমদের চাকরীর সংরক্ষণ করে দিয়েছিলেন ৮০ শতাংশ। সেই ধারা আজকের রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতৃত্বরা সমানভাবে বজায় রেখেছে। তিনি কোরান থেকে উদ্ধৃতি তুলে সকলকে দেখান যে ইসলাম কখনও অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বন্ধু হতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই বলেন যে সব বুদ্ধিজীবীরা, তাঁরা কোরান না পড়েই শুধু ভণ্ডামি করে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে নমঃশূদ্র হিন্দুদের রক্ষায় ঠাকুরনগরের প্রাণপুরুষ ব্যারিস্টার পি. ঠাকুরের দূরদর্শিতা এবং বিপরীতক্রমে ক্ষমতালোভী মুসলিম পদলেহনকারী নেতা যোগেন মণ্ডলের উদাহরণ দেন। বামফ্রন্ট শাসনের চৌত্রিশ বছর ও তাদেরই উত্তরসূরী হয়ে মমতা ব্যানার্জী যেভাবে মুসলিম সমাজের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছেন তা পশ্চিমবঙ্গে উপর একটা অশনি সঙ্কেত। এরা হিন্দুদের বাক্ স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এমন কি সামাজিক ন্যায়ের অধিকারও ছিনিয়ে নিতে চায়। হিন্দু সংহতির প্রচারিত হিন্দি হ্যাণ্ডবিল নিয়ে তাঁর কাছে যে ফোন আসছে এবং প্রশাসন তাঁকে গ্রেপ্তারও করতে পারে বলে তিনি জানান। কিন্তু অকুতোভয় হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী ঘোষ এই নির্লজ্জ মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে সমস্ত হিন্দু সমাজকে প্রতিবাদী হতে ও লড়াই করতে আহ্বান জানান।

এছাড়াও অজিত অধিকারী, প্রশান্ত পাল সহ হিন্দু সংহতির বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংহতি কর্মী অ্যাডভোকেট ব্রজেন রায়, সুষেণ বিশ্বাস প্রমুখ। হিন্দু সংহতির সভা ঠাকুরনগরের হিন্দুদের মধ্যে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সভার আহ্বায়ক ছিলেন ঠাকুরনগর শাখার হিন্দু সংহতির কর্মী দুলাল সমাদ্দার।

# লাভ জেহাদ থেকে রক্ষা করা হল

### বারুইপুর

দঃ ২৪ পরগণার বারুইপুর ব্লকের রামনগর (পুরানো কালীবাড়ি) গ্রামে গৌতম সরদারের একমাত্র মেয়ে অনিতা সরদার (বয়স ১৭), দশম শ্রেণীর ছাত্রী। বারুইপুর মদারাট বাদামতলা এলাকার মিলান শেখ নামক এক মুসলিম ছেলে অনিতাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। হিন্দু সংহতির সহায়তায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। গত লক্ষ্মীপূজার দিন সকালে অনিতা প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাওয়ার সময় তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হিন্দু সংহতির বারুইপুর ব্লকের সভাপতি সমর ভট্টাচার্য এবং রামনগরের কর্মী প্রিয়ঙ্কর সাপুই ও তপন মণ্ডলের নেতৃত্বে দু'দিন পরে মেয়েটিকে উদ্ধার করে তার বাবা-মা'র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

### হিঙ্গলগঞ্জ

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট ব্লকের হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাঁকড়া গ্রাম। ২৩শে নভেম্বর স্কুলে যাওয়ার পথে ১৩ বছরের সোনালি ঘোষকে (নাম পরিবর্তিত) মুসলমান দুষ্কৃতি সাহিদ গাজী রাস্তা থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে ২৬ তারিখ ঐ অঞ্চলের এক সংহতি কর্মী হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফোন করে সমস্ত ঘটনা জানায়। হিন্দু সংহতির প্রধান তপন ঘোষ খবরটি পেয়ে দ্রুত প্রশাসনকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলেন। অবশেষে শ্রী ঘোষের তৎপরতায় ও প্রশাসনের সহযোগিতায় মেয়ের বাবা-মা মেয়েটিকে ফিরে পায়।

# কলকাতার রাজপথ দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চল

কলকাতার বুকে মুসলিম যুবকদের, এমন কি শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের মধ্যেও অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি কলকাতার রাজপথে ছিনতাই করতে গিয়ে দুজন মুসলিম যুবকের ধরা পড়াটাই তার উদাহরণ। এই দুই যুবক হল ধনী পরিবারের ছেলে মহম্মদ আজবর ওরফে অম্বর, শ্যামাপ্রসাদ কলেজের বি.কম-এর ছাত্র। নাইট ক্লাবের খরচ চালাবার জন্যই সে ছিনতাই করতো বলে জানায়। অপরজন মহম্মদ সামশের ওরফে সানি। এদের দুজনেরই বাড়ি খিদিরপুর অঞ্চলের মোমিনপুরে।

মহম্মদ আজবর ও মহম্মদ সামশের কয়েক মাস ধরে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাইক নিয়ে মহিলাদের গলা থেকে হার ছিনতাই করছিল। প্রসঙ্গত, ১৭ই নভেম্বর শনিবার বেলা প্রায় ৩-৩০টায় শ্রীমতি শশীকলা মালাসিকা (৫৯ বছর) যখন আলিপুর জাজেস কোর্টের সামনের রাস্তা পার হচ্ছিলেন তখন এই দুই দুষ্কৃতি পিছন থেকে বাইক নিয়ে এসে হার ছিনতাই করে। শনিবার রাতেই মোমিনপুরের ময়ূরভঞ্জ রোড, যা ইকবালপুর থানার অন্তর্গত সেখান থেকে ছিনতাইবাজদের বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ এবং মহম্মদ আজবর ও মহম্মদ সামশেরকে গ্রেপ্তার করে। কোর্টে তোলা হলে দুই ছিনতাইবাজকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় কোর্ট। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে, গত কয়েক মাসে এরা অন্ততঃ এরকম ছ'টি ছিনতাইয়ের ঘটনা কলকাতায় ঘটিয়েছে। পুলিশের বিশ্বাস এরা আরও অনেক ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত।

# দেগঙ্গায় হিন্দুরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে

**দেগঙ্গার হিন্দুরা একদম ভালো নেই। ২০১০ সালের ৬, ৭, ৮ই সেপ্টেম্বরের আতঙ্কের তিনদিন তারা ভুলতে পারেনি। আজও দেগঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় মুসলিমরা হামলা, আক্রমণ বা কোন সামান্য ব্যাপারে হিন্দুদের অপমানিত করলেও কোন গ্রামের হিন্দু যুবকরা সামান্য প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। দিনের বেলায়ও মুসলিম দুষ্কৃতির হাতে হিন্দু মেয়েদের অপমানিত হতে হচ্ছে। এখনও প্রশাসন হিন্দুর ওপর অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদে কোন হিন্দু সংগঠনকে মিটিং করা তো দূরের কথা সামান্য প্রচারপত্র ও পোস্টার মারতে দিচ্ছে না। তাই দেগঙ্গার হিন্দুদের মনোবল ভেঙে পড়ছে।**

# উলুবেড়িয়ায় কালীপুজোর প্যাণ্ডেলে আগুন

ঘটনার সূত্রপাত, কালীপূজার তিনদিন আগে নোনা ফরওয়ার্ড ক্লাবের সদস্যদের পূজার চাঁদা তেলা নিয়ে এক মুসলিম অটো চালকের সঙ্গে তাদের গণ্ডগোল বাঁধে। অভিযোগ, অটো ড্রাইভার শুধু চাঁদা দিতেই অস্বীকার করেনি, হিন্দুধর্ম নিয়েও নোংরা কথা বলতে থাকে। এতে উত্তেজিত ক্লাবের সদস্যরা অটো ড্রাইভারকে মারধোর করে। তখনকার মতো মার খেয়ে অটো ড্রাইভারটি চলে যায় ও নিজের অঞ্চলে গিয়ে মুসলিমদের উত্তেজিত করে। তিনদিন পর ১৩ই নভেম্বর কালীপূজার রাতে দুটোর সময় অটো ড্রাইভার ও দুজন মুসলিম দুষ্কৃতি এসে নোনা ফরওয়ার্ড সংঘের কালীপূজার প্যাণ্ডেলে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে কালীমা'র মূর্তিটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনজন দুষ্কৃতির মধ্যে একজন ধরা পড়লে তাকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতবড় ঘটনার পরও পুলিশ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার না করে শুধু হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সুস্থ হয়ে লোকটি বাড়ি চলে যায়। এলাকায় চাপা উত্তেজনা আছে। ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা দুষ্কৃতিদের যে কোনরকম কুকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

# চাঁদপাড়ায় উৎপাত

উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটার চাঁদপাড়ার পেট্রোল পাম্পের কাছে উদয়ন সংঘ ক্লাব প্রতি বছরের মতো এবারও জগদ্ধাত্রী পূজা করেছিল। গত ২৫শে নভেম্বর পূজা উপলক্ষে তারা এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান চলাকালীন আলমগীর, কউচার সহ কয়েকজন মুসলিম অনুষ্ঠানের মধ্যে নাচানাচি করতে থাকে ও হিন্দু মেয়েদের নানাভাবে কটুক্তি করতে থাকে। একসময়ে তারা বেসামাল হয়ে মেয়েদের গায়ে পড়লে ক্লাবের সদস্যরা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়। মুসলিম যুবকরা ঝামেলা করলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। এতে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলিম যুবকদের ধাওয়া করে। আলমগীর বা কউচারকে ধরতে না পারলেও অন্যদের ধরে বেধড়ক মারে এবং তাদের বাড়ি ও মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। পরদিন উভয়পক্ষ থেকেই থানায় ডায়েরি করা হয়। পুলিশ মুসলিমদের করা অভিযোগকে কোন গুরত্ব দেয়নি এবং কোন হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করেনি। গাইঘাটার চাঁদপাড়ার এই ঘটনা ঐক্যবদ্ধ হিন্দুর জয়লাভের এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

# দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলাশাসকের হিন্দু বিরোধী আচরণ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত কেশবপুর গ্রাম। দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা বলে পরিচিত। ঐ গ্রামে মাত্র কুড়ি ঘর মুসলমানের বাস। স্বভাবতঃ এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান কোন বিরোধ নেই। কিন্তু গত ২০শে আগস্ট, সোমবার ঈদের দিনে শান্ত কেশবপুর গ্রামে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হল যখন প্রশাসন থেকে মুসলমানদের দু একর ৪২ শতক জমিতে নামাজ পড়ার অনুমতি দিল। প্রসঙ্গত এই জমির পাশেই বহু প্রাচীন এক শিবমন্দির আছে এবং হিন্দুরা কোন অবস্থাতেই ঐ মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হতে দিতে রাজি ছিল না। গ্রামের সকল হিন্দু ঐ জমির পাশে গিয়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। মুসলমানদের কেন ঐ জমিতে নামাজ পড়তে দেওয়া হল তা জিজ্ঞাসা করাতে পুলিশ ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ও হিন্দুদের ক্ষোভকে শান্ত করার জন্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ লোকেরা যেমন ডি.এম., এ.ডি.এম., এস.ডি.ও., এবং এস. ডি. পি. ও. দ্রুত ঐ অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। গঙ্গারামপুর থানায় এলাকার হিন্দুদের সঙ্গে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এক মিটিং হয়। মিটিং-এ ডি.এম.-এর প্রতিটা কথা ছিল হিন্দু বিরোধী। এরকম অবস্থায় কেশবপুর গ্রামের লোকদের মিটিং বয়কট করা উচিত ছিল, যদিও তারা মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি। কিন্তু যখন ডি.এম. বলেন, ঐ জমি থেকে শুধুমাত্র সাত শতক জমি হিন্দুদের মন্দির ও পূজা করার জন্য দেওয়া হবে তখন হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে আসে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে আদিবাসী হিন্দুরাও বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে প্রবল প্রতিবাদে সামিল হয়। ডি.এম. একরকম হুমকির সুরে হিন্দুদের বলেন যে, এই মিটিং ছেড়ে গেলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। তবুও হিন্দুরা এই হুমকিকে উপেক্ষা করে মিটিং বয়কটের সিদ্ধান্তে বহাল থাকে।

হিন্দুরা এই ঘটনার প্রতিবাদী হয়ে কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে। এই মামলার কেস নম্বর হল WPN0:21656 । এলাকায় উত্তেজনা আছে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012